ইউনিট- ১১

মাছের রোগ ও প্রতিকার

ভূমিকা

যাবতীয় জীবিত প্রাণীর মতো মাছও তার জীবদ্দশায় নানা ধরনের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এসব রোগ-ব্যাধি মাছের জীবনকে নানাভাবে দূর্বিষহ করে তোলে। শুধু তা-ই নয়, মাছের এসব রোগ-ব্যাধি নানাভাবে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থার উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। মাছের রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে রোগ কাকে বলে, সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেওয়া একান্তভাবেই প্রয়োজন। যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন, কোনো জীবিত প্রাণী যদি তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পরিনির্বাহের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার শারীরিক দুর্বলতা বা প্রতিকূলতা অনুভব করে, তবে দেহের সেই অবস্থাকে রোগাক্রান্ত দশা বা রোগ নামে অভিহিত করা হয়। মাছ নানাভাবে রোগাক্রান্ত হতে পারে। এসব রোগের কারণের মধ্যে রয়েছে ভাইরাস ছত্রাক, বিভিন্ন প্রকার পরজীবী এবং অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন প্রকার কারণ।

পাঠ-১১.১ : ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মাছের ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের নাম বলতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ বিস্তারের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের লক্ষণ বলতে পারবেন।

সাধারণভাবে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগের সংক্রমণ যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।ব্যাকটেরিয়ার তীব্রতার মাত্রা এবং সব ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মাছের প্রজাতি এবং জলাশয়ভেদে নানারকম হয়ে থাকে। জলজ পরিবেশে বেশি পরিমাণে জৈব পদার্থের উপস্থিতি এবং বেশি তাপমাত্রার কারণে জলাশয়ে জৈব পদার্থসমূহের যে পচন সংঘটিত হয়, মূলত তা-ই জলাশয়ের মাছে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ও বিস্তার ঘটায়। নিচে এসব রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

কলামনারিস রোগ

এটি একধ রনের ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ। সাধারণত স্বাদু পানির জলাশয়ে চাষ করা হয় এমন মাছে এই রোগের প্রকোপ খুব বেশি হয়ে থাকে।

রোগের জীবাণু : এই রোগ সৃস্টির জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার নাম ফ্লেক্সিব্যাক্টর কলামনারিস (Flaxibactor columnaris)।

রোগের বিস্তার: এ ব্যাকটেরিয়া সাধারণত মাছের ত্বক ও ফুলকায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সংক্রামণ সাধারণত পাখনার গোড়া থেকে শুরু হয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তবে প্রধানত মাছের মাথা, পৃষ্ঠদেশ এবং ফুলকা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। পানিতে অক্সিজেনের মাত্রা কম হলে বা জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি হলে এই ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বেশি হয়।

রোগের লক্ষণ : এই রোগের লক্ষণ নিম্নরূপ :

(ক) মাছের মাথা, পৃষ্ঠদেশ এবং ফুলকায় ক্ষতরোগ দেখা দেয়।

(খ) সংক্রামণের প্রাথমিক অবস্থায় দেহে ছত্রাকের অনুরূপ সাদা ফোঁটা হয় এবং ফোঁটার চারপাশে লালচে বৃত্ত দেখা দেয়।

(গ) মাছের ফুলকাতে ঘা দেখা দেয়।

(ঘ) পরিশেষে মাছ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

পাখনা ও লেজ পচা রোগ

এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।

রোগের জীবাণু : এই রোগের জীবাণু হিসেবে প্রধানত সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্সকেই (Pseudomonas florescens) সনাক্ত করা হয়ে থাকে। তবে মিক্সোব্যাকটর (Myxobactor) গণের কয়েকটি প্রজাতিও এই রোগ সংক্রমণে মুখ্য ভূমিকা রাখে।

রোগের বিস্তার: সাধারণত স্বাদু পানিতে চাষাবাদ করা হয় এমন কার্প জাতীয় মাছে এই রোগের সংক্রামণ বেশি হয়ে থাকে। তবে ক্যাটফিশ জাতীয় মাছেও এ রোগ দেখা যায়। মৎস্যবিজ্ঞানীদের মতে, জলাশয়ের বিভিন্ন পরিবেশগত নিয়ামক পরিবর্তিত হলেও এ জীবাণুর সংক্রামণ বৃদ্ধি পায়।

রোগের লক্ষণ : এ রোগের বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে। নিচে এগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো :

ক) মাছের দেহের পিচ্ছিল আবরণ কমে যায়, স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য কমে গিয়ে মাছের দেহ কালচে বর্ণ ধারণ করে।

খ) লেজ ও পাখনায় সাদাটে দাগ সৃষ্টি হয়, পরে সেখানে পচন ধরে এবং শেষ পর্যায়ে সেগুলো খসে যায়।

গ) মাছ খাদ্য গ্রহণে অনীহা প্রদর্শন করে এবং ক্রমশ দেহের ভারসাম্য কমে যায়।

ঘ) মাছে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং দেহের রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

সারমর্ম

মাছ চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে মাছে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ দেখা দেয়। এসব ব্যাকটেরিয়া মাছে বিভিন্ন ধরনের রোগের সংক্রমন ঘটায়। এসব সংক্রমণ মাছ চাষ প্রক্রিয়াকে সে সময়ের জন্য পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারে কারণ এসব রোগে মাছের ব্যাপকভাবে মড়ক দেখা দেয়। পানির গুণাগুণ পরিবর্তন হলে বা পানিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও এসব ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ অত্যধিক হারে দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। নিচে উল্লিখিত কোনটি কলামনারিস রোগের জীবাণু?

(ক) ফ্লেক্সিব্যাক্টর কলামনারিস (খ) সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্সকেই

(গ) ইকাথায়োপথিরিয়াসিস মালটিফিলিস (ঘ) ট্রাউকোডিনা পেডিকুলাস

২। পাখনা ও লেজা পচা রোগের প্রাথমিক লক্ষণ কোনটি?

(ক) মাছের দেহের পিচ্ছিল আবরণ বেড়ে যাবে (খ) লেজ ও পাখনায় সাদাটে দাগ সৃষ্টি হয়

(গ) মাছের মাথায় পচন দেখা দেয় (ঘ) মাছ পানিতে ভাসতে থাকে

পাঠ-১১.২ : অপুষ্টি ও পরজীবীজনিত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- অপুষ্টিজনিত রোগ কাকে বলে বলতে পারবেন।
- মাছের বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মাছের অপুষ্টিজনিত রোগের কারণ সঠিকভাবে বলতে পারবেন।
- পরজীবী কাকে বলে বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের পরজীবীর নাম বলতে পারবেন।
- পরজীবীঘটিত রোগের কারণ সঠিকভাবে বলতে পারবেন।

দেহের ক্ষয়পূরণ করে বৃদ্ধি সাধন করার জন্য এবং দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনের জন্য জীবিত যে কোনো জীবের জন্য খাদ্য একান্তভাবে প্রয়োজন। এজন্য জীব যা গ্রহণ করে, তাই খাদ্য হিসেবে চিহ্নিত। খাদ্য দেহে যে প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়, তাকে পুষ্টি প্রক্রিয়া বলে। যে কোনো জীবের পুষ্টি প্রক্রিয়াই যথেষ্ট জটিল কার্যপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়। মাছের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরকম। পুষ্টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গৃহীত খাদ্য পরিপাক ও শোষিত হয় এবং তা দেহের বিভিন্ন প্রকার ক্ষয় পূরণ, বৃদ্ধি সাধন এবং শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে মাছ চাষের ক্ষেত্রে অপুষ্টির কারণে রোগের প্রকাশ বেশি পরিমাণে দেখা যায়। বাংলাদেশের জলাশয়সমূহের মাছে যেসব পুষ্টিজনিত রোগ দেখা যায়, সেসব সম্পর্কে নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

মাছের অপুষ্টিজনিত রোগ

মাছের পুষ্টির জন্য সাধারণভাবে যেসব খাদ্যোপাদান প্রয়োজন, তার মধ্যে প্রধানগুলো হচ্ছে, (ক) আমিষ, (খ) শর্করা, (গ) চর্বি, (ঘ) ভিটামিন, (ঙ) খনিজ পদার্থ এবং (চ) পানি।

খাদ্যে উপরোক্ত পুষ্টি উপাদানসমূহ যথাযথ মাত্রায় না থাকলে পুষ্টির অভাবজনিত রোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া খাদ্যে কিছু পুষ্টিবিরোধী উপাদান থাকে, যেগুলো মাছের রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী। নিচে পুষ্টির অভাবজনিত রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

(ক) আমিষের অভাবজনিত রোগ : খাদ্যে প্রয়োজনীয় আমিষের অভাবে মাছের দৈহিক বর্ধন হ্রাস পায়। এছাড়া এতে মাছের বৃক্কে অস্বাভাবিক মাত্রায় ক্যালসিয়াম জমা হয়। একে রেনাল ক্যালশিনোসিস বলা হয়। খাদ্যে ট্রিপটোফেন এবং মেথিওনিন নামক দুটি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের উপস্থিতি কম হলে চোখে ছানি পড়তে পারে।

(খ) চর্বির অভাবজনিত রোগ : মাছের খাদ্যে চর্বিজাতীয় পদার্থের উপস্থিতি কম হলে মাছে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। দেহের জন্য অত্যাবশকীয় চর্বির অভাব ঘটলে মাছের বৃক্ক ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং ফুলে যায়। এতে মাছের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

(গ) ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ : খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভিটামিন না থাকলে মাছের দেহে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন–

(১) ভিটামিন এ-এর অভাবে মাছ অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

(২) ভিটামিন ডি-এর অভাবে মাছের বৃক্ক ক্ষয়প্রাপ্ত এবং ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

(৩) ভিটামিন ই-এর অভাবে মাছের রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

(৪) ভিটামিন সি-এর অভাবে মাছের দেহে ক্ষত সৃষ্টি হলে তা শুকাতে দেরি করে।

(৫) ভিটামিন বি৫ এর অভাবে মাছের ফুলকাতে ক্ষত রোগ দেখা দেয়।

(৬) ভিটামিন বি১ এর অভাবে মাছের দেহে অবশতা দেখা দেয় এবং মাছ মৃত্যুবরণ করে।

(৭) ভিটামিন বি৩ এর অভাবে মাছের পেটে অত্যধিক পরিমাণে পানি জমা হয়।

(ঘ) খনিজ পদার্থের অভাবজনিত রোগ : খাদ্যে খনিজ পদার্থের বিশেষত খনিজ লবণের অভাব ঘটলে মাছের অস্থি গঠনে বাধা সৃষ্টি হয়। খাদ্যে দস্তার পরিমাণ কম হলে মাছের চোখে ছানি পড়ে এবং খাদ্যে আয়োডিনের অভাব হলে মাছে থাইরয়েড গ্রন্থিজনিত সমস্যা দেখা দেয়।

সাধারণভাবে মাছ চাষের ক্ষেত্রে পরজীবীঘটিত রোগের প্রকোপ বেশি পরিমাণে দেখা যায়। পরজীবী হলো এমন এক ধরনের জীব যার নিজের দেহের চেয়ে বড় আকারের কোন জীবের দেহে বসবাস করে, সেই জীবের দেহ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে নিজের দৈহিক পুষ্টি এবং অস্তিত্ব বজায় রাখে কিন্তু সেই বড় আকারের জীবের দেহে নানা ধরনের সমস্যা এমনকি তার মৃত্যুরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।বড় আকারের এই জীব পোষক নামে পরিচিত।পরজীবী তীব্রতার মাত্রা এবং এসব পরজীবী রোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জলাশয়ভেদে নানারকম হয়ে থাকে। জলজ পরিবেশ বেশি পরিমাণে জৈব পদার্থের উপস্থিতি এবং বেশি তাপমাত্রার কারণে জলাশয়ে জৈব পদার্থসমূহের যে পচন সংঘটিত হয়, মূলত তা-ই জলাশয়ের মাছে নানা ধরনের পরজীবীর সংক্রমণ ঘটায়। বাংলাদেশের জলাশয়সমূহের মাছে যেসব পরজীবী দেখা যায়, ধরন অনুযায়ী সে সবকে দুই ভাগে ভাগ করা য়ায়। যেমন–

(ক) প্রেটোজোয়ান পরজীবীঘটিত রোগ (Protozoan Disease)

(খ) বহুকোষী পরজীবীঘটিত রোগ (Metazoan Disease)

নিচে মাছের বিভিন্ন ধরনের পরজীবী সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

১. প্রোটোজোয়াঘটিত রোগ

এ ধরনের রোগ সাধারণত কার্প জাতীয় মাছেই বেশি দেখা যায়। এসব পরজীবী সাধারণত মাছের দেহের আভ্যন্ড়রীণ এবং বাহ্যিক বা বহিস্থ উভয় ধরনের পরজীবী হিসেবেই বিরাজ করে। এজাতীয় পরজীবী দ্বারা আক্রান্ড় হলে মাছে সাধারণত কোন ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তবে মাছ ক্রমশই দুর্বল হতে থাকে এবং একসময় মারা যায়। বাংলাদেশের জলাশয়সমূহে সাধারণত নিম্নলিখিত ধরনের প্রোটোজোয়া পরজীবী দেখা যায়।

(১) সাদা দাগ রোগ বা ইকথাইয়োপথিরিয়াসিস

(২) ট্রাইকোডিনিয়াসিস

(৩) মিক্সোসপোরিডিয়াসিস

(৪) কৃমিসৃষ্ট রোগ

নিচে এসব রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

সাদা দাগ রোগ

রোগ জীবাণু : এটি এক ধরনের এককোষী পরজীবীসৃষ্ট রোগ। এ রোগের জীবাণুর নাম ইকথায়োপথিরিয়াস মালটিফিলিস (Icthyopthirius multiphilis)।

রোগের বিস্তার : বাংলাদেশে যেসব জলাশয়ে কার্প জাতীয় মাছ চাষাবাদ করা হয়, সেসব এলাকায় এই রোগ একটি বিভীষিকা হিসেবে পরিচিত। কারণ এসব জলাশয়ে এই রোগ প্রায়ই মহামারী হিসেবে দেখা যায়। শুধু দেশী কার্প জাতীয় মাছেই নয়, এই রোগ বিদেশী কার্পেও মহামারী সৃষ্টি করতে পারে। আঙুলে পোনার ক্ষেত্রে এ রোগের সংক্রমণের তীব্রতা বেশি হয়ে থাকে। স্বাদু ও অর্ধ-লোনা পানির জলাশয়ে সাধারণত এ রোগ বেশি দেখা যায়। জলাশয়ের তাপমাত্রা ২৫° থেকে ২৬° সেন্টিগ্রেড হলে এই রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ফলে গ্রীষ্মকাল ও বসন্তকালে সাদা দাগ রোগের তীব্রতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। জলাশয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে মাছ থাকলে এই রোগ প্রায় মহামারী রূপ ধারণ করে।

রোগ লক্ষণ

সাদা দাগ রোগের বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে, যার সাহায্যে খুব সহজেই এ রোগ শনাক্ত করা যায়। নিচে এসব লক্ষণ উল্লেখ করা হলো :

(ক) মাছের ত্বক, পাখনা এবং কানকোতে বিন্দুর মতো ছোট ছোট সাদা সাদা দাগ দেখা যায়।

(খ) রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে মাছের দেহ সাদা বর্ণের ঝিল্লীতে আবৃত হয়ে যায়।

(গ) মাছের দেহের স্বাভাবিক পিচ্ছিল ভাব হ্রাস পায় এবং দেহের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায়।

(ঘ) দেহে রোগ সংক্রমণ হলে মাছ পানিতে লাফালাফি করে, পানির বিভিন্ন খসখস বস্তুর সাথে দেহ ঘষতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মাছ পানিতে অলসভাবে চলাফেরা করতে থাকে।

ট্রাইকোডিনিয়াসিস

রোগের জীবাণু : ট্রাইকোডিনিয়াসিস একধরনের এককোষী পরজীবীসৃষ্ট রোগ। এই রোগের জন্য দায়ী কয়েকটি পরজীবীর নাম হলো : ট্রাইকোডিনা ডুমেরগুয়েই (Tricodina domerguei), ট্রাইকোডিনা পেডিকুলাস (Tricodina pediculus), ট্রাইকোডিনা নাইগ্রা (Tricodina nigra) ইত্যাদি। এ ধরনের পরজীবী সাধারণত মাছের ফুলকা আক্রমণ করে।

রোগের বিস্তার: সাধারণত বিভিন্ন ধরনের কার্প মাছের ধানি পোনা এবং আঙুলে পোনাতে এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। বিশেষত রুই জাতীয় মাছ এ পরজীবী দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত মাছের স্পর্শে এই রোগ বেশি বিস্তার লাভ করে। এছাড়া জলাশয়ের পানির গুণাগুণ বিনষ্ট হলে এ পরজীবীর আক্রমণ বেশি দেখা যায়। নার্সারি পুকুরে পোনা মাছের পরিমাণ অত্যধিক বেশি হলেও এ রোগের বিস্তার লাভ ঘটে।

রোগ লক্ষণ : ট্রাইকোডিনিয়াসিস রোগের সুনির্দিষ্ট কিছু কিছু লক্ষণ রয়েছে, যার সাহায্যে এ রোগ খুব সহজেই সনাক্ত করা যায়। নিচে এসব লক্ষণ উল্লেখ করা হলো :

(ক) এ পরজীবীর আক্রমণ হলে মাছের দেহে বেশি পরিমাণে শ্লেষ্মা দেখা যায়।

(খ) আক্রান্ত মাছের ফুলকা থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়, ফুলকারশ্মিতে পচন ধরে এবং ফুলকাদন্ড বের হয়ে আসে।

(গ) পোনা মাছ খাদ্য গ্রহণে অনাগ্রহ প্রদর্শন করে।

(ঘ) আক্রান্ত মাছ বিক্ষিপ্ত চলাফেরা করে এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায়।

মিক্সোপোরিডিয়াসিস

রোগের জীবাণু : এ রোগ এক ধরনের এককোষী পরজীবীর আক্রমণে সংঘটিত হয়। এ রোগের জীবাণুর নাম মিক্সোবোলাস সিপ্রিনি (Myxoblous cyprini), মিক্সোবোলাস ডিসপার (Myxoblous disper) ইত্যাদি।

রোগের বিস্তার: এটি একটি সংক্রামক রোগ। এ রোগের বিস্তার সাধারণত কার্প জাতীয় মাছের পোনাতে বেশি দেখা যায়। তবে বড় আকারের মাছেও এ রোগের প্রকোপ রয়েছে। বাংলাদেশে কাতলা মাছ ও পোনা এ পরজীবী দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। মিক্সোবোলাস জীবাণু সাধারণত মাছের ফুলকা, মাংসপেশী, পাখনা, পায়ুপথ ইত্যাদিতে রোগের সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে। তবে মাছের দেহের আভ্যন্তরীণ অন্যান্য অংশ যেমন– পাকাস্ত্রিক নালী, বৃক্ক, যকৃত, প্লীহা ইত্যাদিতেও রোগের সংক্রমণ হয়।

রোগ লক্ষণ : বেশ কয়েকটি লক্ষণ দিয়ে খুব সহজেই মাছে এই রোগ সনাক্ত করা যায়। নিচে এসব লক্ষণ বর্ণনা করা হলো :

(ক) মাছের ত্বকে ফোঁড়া ও বুদবুদ দেখা যায়।

(খ) ফুলকায় প্রথমে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং পরে তা পচতে শুরু করে।

(গ) মাছের দেহ গাঢ় বর্ণ ধারণ করে এবং ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে।

(ঘ) মাছ খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে।

(খ) বহুকোষী পরজীবীসৃষ্ট রোগ :

কৃমিসৃষ্ট রোগ

বিভিন্ন ধরনের নিমাটোড, সেসটোড এবং জোঁক মাছের দেহে পরজীবী হিসেবে বিরাজ করে নানা ধরনের রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এসব পরজীবী মাছের দেহে সংক্রমণ ঘটালেও তেমনভাবে মহামারী সৃষ্টি করতে পারে না। তবে মাছের দেহে এসব পরজীবী অন্তঃ এবং বহিঃপরজীবী হিসেবে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। এধরনের রোগের মধ্যে প্রধান তিনটি রোগ হলো :

(ক) ড্যাকটাইলোগাইরোসিস (Dactylogyrosis)

(খ) গাইরোড্যাকটাইলোসিস (Gyrodactylosis)

(গ) লার্নিয়াসিস (Lerneasis)

নিচে এসব রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

ড্যাকটাইলোগাইরোসিস

এ রোগটি মাছের ফুলকা কৃমি রোগ নামে পরিচিত।

রোগজীবাণু : এই রোগ সৃষ্টি হয় Dactylogyrus নামক একধরনের পরজীবী দিয়ে। এই পরজীবীর কয়েকটি প্রজাতি মাছের দেহে সংক্রামণ ঘটিয়ে থাকে। এসব প্রজাতি হলো : ড্যাকটাইলোগাইরাস ল্যামেলেটাস (Dactylogyrus lamellatus), ড্যাকটাইলোগাইরাস অ্যারিসটিকথিস (D. aristicthys), এবং ড্যাকটাইলোগাইরাস ভ্যাসটেটর (D. vastators)।

রোগের বিস্তার: এসব সাধারণত মাছের ফুলকা আক্রমণ করে। তবে বড় আকারের বা বয়স্ক মাছের চেয়ে ছোট আকারের বা পোনা মাছই এসব পরজীবী দিয়ে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। অনেকক্ষেত্রে এসব কৃমি মাছে ব্যাপকভাবে বিস্তার বা সংক্রামণ ঘটিয়ে মাছে মড়ক সৃষ্টি

করে। সাধারণত বসন্তকালের শেষদিকে এবং গ্রীষ্মকালের প্রথমদিকে এ পরজীবীর আক্রমণ বেশি দেখা যায়। বাংলাদেশে সাধারণত সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প এবং বিগহেড কার্পে এ পরজীবীর সংক্রমণ বেশি দেখা যায়।

রোগ লক্ষণ : এ ধরনের পরজীবী মাছের দেহে আক্রমণ করেছে কিনা, তা সনাক্ত করার জন্য বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে। এসব লক্ষণ দেখে খুব সহজেই এ পরজীবীর সংক্রমণ সনাক্ত করা যায়।

(ক) মাছের দেহে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়।

(খ) মাছের ফুলকা ফুলে যায় এবং অধিক পরিমাণে রক্তক্ষরণের জন্য ফুলকার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

(গ) কানকো খোলা থাকে কিন্তু মাছের শ্বাসপ্রশ্বাস খুবই কমে যায়।

(ঘ) মাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে সাঁতার কাটে।

এ রোগকে মাছের ত্বকের কৃমি রোগ নামেও অভিহিত করা হয়।

রোগ জীবাণু :এ রোগ সৃষ্টির জন্য বেশ কয়েকটি জীবাণু দায়ী। এসব জীবাণু গাইরোড্যাকটাইলাস (Gyrodactylus sp) নামে পরিচিত।

রোগের বিস্তার**:** এ পরজীবী সাধারণত মাছের ত্বকে সংক্রমণ সৃষ্টি করে। বিশেষত রুই জাতীয় মাছের পোনা এ পরজীবী দিয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। সাধারণত গ্রীষ্মকালে এ পরজীবীর সংক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। এ পরজীবী মূলত ত্বকে সংক্রমণ ঘটালেও অনেকক্ষেত্রে এটি মাছের ফুলকাকেও আক্রমণ করে থাকে।

রোগের লক্ষণ : গাইরোড্যাকটাইলাস জাতীয় পরজীবী মাছের দেহে সংক্রমণ ঘটিয়েছে কিনা, তা বোঝার জন্য বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে নিচে সেসব উল্লেখ করা হলো-

(ক) মাছের দেহের আঁইশ ফুলে যায়, দেহ লালচে বর্ণ ধারণ করে এবং আক্রান্ত মাছের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য থাকে না।

(খ) পরজীবী আক্রান্ত মাছ ছটফট করতে থাকে, পানিতে দ্রুত সাঁতার কাটতে থাকে এবং পরজীবীর হাত থেকে বাঁচার জন্য পানিতে ভাসমান বা নিলম্ব কোন কিছুর সাথে দেহ ঘঁষতে থাকে।

(গ) অনেকক্ষেত্রে আক্রান্ত মাছের চোখ প্রথমে ঘোলা হয়ে যায় এবং মাছ অন্ধ হয়ে যায়।

লার্নিয়াসিস

এ রোগকে মাছ আংটা কৃমি নামেও অভিহিত করা হয়।

রোগের জীবাণু : এ রোগ সৃষ্টির কারণ হিসেবে যেসব জীবাণু দায়ী সেগুলো হচ্ছে– লার্নিয়া পলিমরফি (Lernaea polymorphy), লার্নিয়া সাইপ্রেনাসিয়া (L.cyprinacea) লার্নিয়া টিনোফ্যারিঞ্জোডনটিস (L.ctenopharyngodontis)

রোগের বিস্তার : দেশীয় কার্প জাতীয় মাছ এবং বিদেশী কার্প জাতীয় মাছে এই পরজীবী বেশি সংক্রমণ ঘটায়। শুধু বয়স্ক মাছেই নয়, এ পরজীবী এসব মাছের জীবনচক্রের প্রায় সব দশাতেই দেখা যায়। সাধারণত এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাসে এ রোগের সংক্রমণ বেশি দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ : এ পরজীবীর আক্রমণের লক্ষণ নিম্নরূপ :

(ক) প্রাথমিক অবস্থায় মাছ অস্বস্তিকর অবস্থা প্রদর্শন করে।

(খ) মাছের দেহে পরজীবী আক্রান্ত অংশে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, লালচে বর্ণ ধারণ করে এবং ফুলে যায়।

(গ) সংক্রমণের মাত্রা বেশি হলে মাছের দেহে ঘা-এর সৃষ্টি হয় এবং মাছ পানিতে ছুটাছুটি করতে থাকে।

মাছের ডিম, পোনা এবং বড় মাছের দেহে মিহি সুতার ন্যায় দেখা দেয়।

সারমর্ম

মাছ চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে মাছের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ না করা হলে মাছের দেহে পুষ্টিজনিত নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। পুষ্টি সমস্যা এককভাবে মাছে দেখা দিলেও অনেকসময় তা মাছে ব্যাপক মড়ক সৃষ্টি করে। মাছ চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে মাছে নানা ধরনের পরজীবীর সংক্রমণ দেখা দেয়। এসব পরজীবী মাছে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। এসব রোগ দীর্ঘস্থায়ী হলে মাছ চাষ প্রক্রিয়াকে সে সময়ের জন্য পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারে কারণ এসব রোগে মাছের ব্যাপকভাবে মড়ক দেখা দেয়। পানির গুণাগুণ পরিবর্তিত হলেও এসব পরজীবীর সংক্রমণ অত্যধিক হারে দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। নিচে উল্লিখিত কোন ভিটামিনের কারণ মাছে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

(ক) ভিটামিন এ (খ) ভিটামিন বি৩

(গ) ভিটামিন ই (ঘ) ভিটামিন বি৫

২। খাদ্যে আমিষের অভাব হলে কি রোগ হয়?

(ক) মাছের দৈহিক বর্ধন হ্রাস পায় (খ) মাছ অন্ধ হয়ে যেতে পারে

(গ) মাছে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় (ঘ) মাছের ফুলকাতে ক্ষত রোগ দেখা দেয়

৩। কোন রোগটি মাছের ফুলকা কৃমি রোগ নামে পরিচিত।

(ক) ড্যাকটাইলোগাইরোসিস (খ) লার্নিয়াসিস

(গ) গাইরোড্যাকটাইলোসিস (ঘ) মিক্সোপোরিডিয়াসিস

৪। সাদা দাগ রোগের প্রধান লক্ষণ কি?

(ক) মাছের ত্বকে ফোঁড়া ও বুদবুদ দেখা যায়

(খ) পোনা মাছ খাদ্য গ্রহণে অনাগ্রহ প্রদর্শন করে

(গ) মাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং খুব ধীরে ধীরে সাঁতার কাটে

(ঘ) মাছের ত্বক, পাখনা এবং কানকোতে বিন্দুর মতো ছোট ছোট সাদা সাদাা দাগ দেখা যায়।।

পাঠ-১১.৩ : ভাইরাসজনিত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মাছের ভাইরাসজনিত রোগের নাম বলতে পারবেন।
- ভাইরাসজনিত রোগ বিস্তারের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাইরাসজনিত রোগের লক্ষণ বলতে পারবেন।

ভাইরাসজনিত রোগ

সাধারণভাবে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ভাইরাসজনিত রোগের সংক্রমণ যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। ভাইরাসের তীব্রতার মাত্রা এবং এসব ভাইরাসঘটিত রোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মাছের প্রজাতি এবং জলাশয়ভেদে নানারকম হয়ে থাকে। জলজ পরিবেশে বেশি পরিমাণে জৈব পদার্থের উপস্থিতি এবং বেশি তাপমাত্রার কারণে জলাশয়ে জৈব পদার্থসমূহের যে পচন সংঘটিত হয়, মূলত তা-ই জলাশয়ের মাছে নানা ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ ও বিস্তার ঘটায়।

বাংলাদেশে মাছ চাষের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন জলাশয়ে বেশ কয়েক ধরনের ভাইরাসঘটিত রোগ মাছে পরিদৃষ্ট হয়। নিচে এসব রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

ড্রপসি

ভাইরাসঘটিত এ রোগটি বিজ্ঞানীদের কাছে স্প্রিং ভাইরেমিয়া নামে পরিচিত। একে সংক্ষেপে এসভিসি বা স্প্রিং ভাইরেমিয়া অব কার্প নামে চিহ্নিত। তবে সাধারণভাবে এ রোগটি ড্রপসি নামেই সমধিক পরিচিত।

রোগের জীবাণু : এ রোগটি র‍্যাবডোভাইরাস কার্পিও (Rhabdovirus carpio) নামক একটি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত।

রোগের বিস্তার : এ রোগ কার্প জাতীয় মাছে সারাজীবনেই দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ পোনা থেকে শুরু করে বয়স্ক মাছে যে কোন সময়েই এ ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। সাধারণত বিদেশী কার্প মাছে এ রোগ সংক্রমিত হলেও দেশী কার্পজাতীয় মাছে এ রোগের বিস্তারও অনেক সময় দেখা যায়। এ ভাইরাসের পোষক হিসেবে রক্তচোষক পরজীবী জোঁক এবং আরগুলাস বেশি পরিচিত। কোনো জলাশয়ের একটি মাছে এ রোগ সংক্রমিত হলে, তা পানির সাহায্যে বাহিত হয়ে সেই জলাশয়ের প্রায় সব মাছকেই সংক্রমিত করে থাকে। এ ভাইরাস সাধারণত মাছের ফুলকাতে বংশবিস্তার করে।

রোগের লক্ষণ : এ রোগের বেশি কিছু লক্ষণ রয়েছে। যেমন–

ক) মাছের দেহ গাঢ় বর্ণ ধারণ করে এবং মাছের ত্বক ও ফুলকাতে রক্তক্ষরণ শুরু হয়।

খ) মাছ দৈহিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।

গ) মাছের চোখ ফুলে যায় এবং বাইরের দিকে বের হয়েআসে।

ঘ) মাছের পায়ুপথে প্রদাহ সৃষ্টি হয়।

র‍্যাবডোভাইরাস রোগ

এ রোগ চাষকৃত মাছের ক্ষেত্রে নানাধরনের বিপত্তির সৃষ্টি করে থাকে।

রোগের জীবাণু : এ রোগের জন্য দায়ী ভাইরাসের নাম র‍্যাবডোভাইরাস (Rhabdovirus sp)।

রোগের বিস্তার : এ রোগ প্রধানত বিদেশী কার্প মাছের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। তবে দেশীয় মাছেও এদের উপস্থিতি কম নয়।

রোগের লক্ষণ : এ রোগের লক্ষণ অনেকটা ড্রপসি রোগের মতো। নিচে এ রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণসমূহ উল্লেখ করা হলো :

(ক) আঁইশের গোড়া ছিঁড়ে যায় এবং রক্তক্ষরণ ঘটে।

(খ) পাখনা ছিড়ে যায় বা পাখনায় পচন ধরে।

(গ) চোখ বাইরের দিকে প্রক্ষিপ্ত হয়ে বের হয়ে আসে।

ঙ। পায়ুপথে প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে রক্তক্ষরণ হয়।

সারমর্ম :

মাছ চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে মাছে নানা ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দেয়। এসব ভাইরাস মাছে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি করে। এসব রোগ দীর্ঘস্থায়ী হলে মাছ চাষ প্রক্রিয়া ধ্বংস হওয়াসহ ব্যাপকভাবে মাছের মড়ক দেখা দেয়। ভাইরাস রোগের মধ্যে ড্রপসি ও র‍্যাবডোভাইরাস রোগ অন্যতম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ড্রপসি রোগের মূল নাম কি?

(ক) স্প্রিং ভাইরেমিয়া (খ) লার্নিয়াসিস

(গ) র‍্যাবডোভাইরোসিস (ঘ) মিক্সোপোরিডিয়াসিস

২। র‍্যাবডোভাইরাস রোগের প্রধান লক্ষণ কি?

(ক) আঁইশের গোড়া ছিড়ে যায় এবং রক্তক্ষরণ ঘটে

(খ) মাছের দেহ গাঢ় বর্ণ ধারণ করে এবং মাছের ত্বক ও ফুলকাতে রক্তক্ষরণ শুরু হয়

(গ) মাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং খুব ধীরে ধীরে সাঁতার কাটে

(ঘ) মাছের ত্বক, পাখনা এবং কানকোতে বিন্দুর মতো ছোট ছোট সাদা সাদা দাগ দেখা যায়।

পাঠ-১১.৪ : ছত্রাকজনিত রোগ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মাছের ছত্রাকজনিত রোগের নাম বলতে পারবেন।
- ছত্রাকজনিত রোগ বিস্তারের কারণবর্ণনা করতে পারবেন।
- ছত্রাকজনিত রোগের লক্ষণ বলতে পারবেন।

সাধারনভাবে স্বাদু পানির বিভিন্ন জলাশয়ে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ছত্রাকঘটিত রোগের সংক্রমণ যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। তবে ছত্রাকের তীব্রতার মাত্রা এবং এসব ছত্রাকঘটিত রোগের কারণে জৈব পদার্থের উপস্থিতি এবং বেশি তাপমাত্রার কারণে জলাশয়ে জৈব পদার্থসমূহের যে পচন সংঘটিত হয়, মূলত তা-ই জলাশয়ে বেশ কয়েক ধরনের ছত্রাকঘটিত রোগের সংক্রমণ ও বিস্তার ঘটায়। তবে নিচে বর্ণিত রোগটি বাংলাদেশে বেশি দেখা যায়।

(ক) স্যাপরোল্যাগনিয়াসিস

নিচে এই রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

স্যাপরোল্যাগনিয়াসিস ছত্রাকজনিত এ রোগটি মাছের তন্তু রোগ নামে সমধিক পরিচিত।

রোগের জীবাণু : এ রোগের জন্য তিনটি পরজীবী দায়ী। এগুলো হলো : স্যাপরোল্যাগনিয় প্যারাসইটিকা (Saprolegnia parasitica), স্যাপরোল্যাগনিয়া ফেরাক্স (Saprolegnia ferax) এবং স্যাপরোল্যাগনিয়া ডিকলিনা (Saprolegnia diclina)।

রোগের বিস্তার : সাধারণত দেশি ও বিদেশী সবধরনের কার্প জাতীয় মাছেই এই রোগের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব রয়েছে। তবে ডিম প্রসবকারী মাছ এবং সদ্য ডিম থেকে বের হওয়া পোনা থেকে শুরু করে কার্প জাতীয় মাছের সকল জীবদ্দশাতেই স্যাপরোল্য গনিয়া রোগের জীবাণু বিস্তার লাভ করতে পারে। তবে পরিবেশগত পীড়ন বা ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস দিয়ে পরীক্ষা করার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছত্রাক মাছের দেহে খুবই দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করে এবং ১০ থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাছের দেহটিকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে। তবে প্রাথমিক অবস্থায় এ ছত্রাক মাছের চোখ, ফুলকা, পাখনা এবং মাছের পৃষ্ঠদেশ ও লেজ সংক্রমিত করে।

রোগের লক্ষণ : স্যাপরোল্যাগনিয়া মাছের দেহে যে রোগ সৃষ্টি করে, তা নিচে উল্লেখিত লক্ষণ দ্বারা বোঝা যায়।

(ক) মাছের ডিম, পোনা এবং বড় মাছের দেহে মিহি সূতার ন্যায় তন্তু দেখা দেয়।

(খ) মাছের দেহে অতিরিক্ত পিচ্ছিল পদার্থের উপস্থিতি দেখা দেয়।

(গ) মাছ অস্থিরভাবে চলাফেরা করতে থাকে এবং শক্ত কিছুতে গা ঘেষতে থাকে।

(ঘ) সংক্রমণ বেশি হলে মাছে ব্যাপকহারে মড়ক দেখা দেয়।

সারমর্ম

মাছ চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরনের ছত্রাক রোগের সংক্রমণ দেখা দেয়। এসব রোগ চাষ প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে দিতে পারে কারণ এসব রোগে মাছের ব্যাপকভাবে মড়ক দেখা দেয়। স্যাপরোল্যাগনিয়াসিস রোগ ছত্রাক রোগের মধ্যে অন্যতম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। স্যাপরোল্যাগনিয়া রোগের পরজীবীর নাম কি?
   (ক) ড্যাকটাইলোগাইরাস অ্যারিসটিকথিস
   (খ) র‍্যাবডোভাইরাস কার্পিও
   (গ) লার্নিয়া সাইপ্রিনাসিয়া
   (ঘ) স্যাপরোল্যাগনিয়া প্যারাসাইটিকা

২। স্যাপরোল্যাগনিয়াসিস রোগের প্রধান লক্ষণ কি?
   (ক) আঁইশের গোড়া ছিঁড়ে যায় এবং রক্তক্ষরণ ঘটে।
   (খ) মাছের ডিম, পোনা এবং বড় মাছের দেহে মিহি সুতার ন্যায় বস্তু দেখা দেয়।
   (গ) মাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং খুব ধীরে ধীরে সাঁতার কাটে।
   (ঘ) মাছের ত্বক, পাখনা এবং কানকোতে বিন্দুর মতো ছোট ছোট সাদা সাদা দাগ দেখা যায়।

ব্যবহারিক

বিষয়-১ : বিভিন্ন প্রকার পরজীবী শনাক্তকরণ

এই পাঠ সমাপ্ত করার পর আপনি-

(ক) বিভিন্ন প্রকার পরজীবীর শারীরিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবেন।
(খ) বিভিন্ন প্রকার পরজীবী শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ

১। ট্রে-২টি
২। পেট্রি ডিশ-২টি
৩। ছুরি-১টি
৪। রোগাক্রান্ত মাছ
৫। আতশী কাচ
৬। অণুবীক্ষণ যন্ত্র

কার্যপদ্ধতি

১। কোনো জলাশয়ে থেকে রোগাক্রান্ত মাছ সংগ্রহ করুন।
২। সংগৃহীত মাছে শারীরিক কোনো অসংগতি রয়েছে কিনা তা আতশী কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করুন এবং তা কোনো পরজীবীর কারণে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
৩। অসংগতিপূর্ণ অংশ থেকে কিছু অংশ ছুরি দিয়ে কেটে তা পেট্রি ডিশে রাখুন এবং পৃথকভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করুন।
৪। সংগৃহীত মাছে কোনো প্রকার ক্ষত আছে কিনা তা আতশী কাচের সাহায্যে ভালোভাবে পরীক্ষা করুন।

৫। কোনো প্রকার পরজীবী পাওয়া গেলে তা সযত্নে সংগ্রহ করুন এবং প্রথমে পরজীবীর আকার বুঝতে চেষ্টা করুন এবং পরে তা চিত্রের সাথে মিলিয়ে নিন।
৬। শেষ পর্যায়ে বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে পরজীবী শনাক্ত করুন।
৭। শনাক্ত করা পরজীবীর চিত্র এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য খাতায় অংকন এবং লিপিবদ্ধ করুন।

বিষয় : বিভিন্ন রোগাক্রান্ত মাছ শনাক্তকরণ

এ অনুশীলন শেষে আপনি–

● রোগাক্রান্ত মাছ শনাক্ত করতে পারবেন।

উপকরণ

১। লেজ ও পাখনা পচা মাছ;
২। ফুলকা পঁচা মাছ;
৩। ক্ষতরোগে আক্রান্ত মাছ;
৪। উকুন আক্রান্ত মাছ;
৫। ট্রে;
৬। আতশী কাঁচ;
৭। চিমটা;
৮। খাতা ও পেন্সিল;
৯। ফরমালিন;
১০। বড় মুখওয়ালা বোতল বা জার।

কাজের ধাপ

১। সব সময় রোগাক্রান্ত মাছ পাওয়া নাও যেতে পারে, সেজন্য ফরমালিন দিয়ে মাছগুলোকে বোতলে রাখুন।
২। ব্যবহারিক ক্লাসে রোগাক্রান্ত মাছগুলো ট্রেতে রাখুন।
৩। আতশী কাচ দিয়ে এর অঙ্গ-প্রতঙ্গ দেখুন।
৪। রোগাক্রান্ত অঙ্গ পর্যবেক্ষণ করুন।
৫। লক্ষণগুলো ভালোমত লক্ষ্য করুন।
৬। ব্যবহারিক খাতায় রোগাক্রান্ত মাছের চিত্র আঁকুন।
৭। রোগের নাম লিখুন এবং লক্ষণগুলো লিপিবদ্ধ করুন।
৮। নিকটস্থ কোন পুকুরে রোগাক্রান্ত মাছের খবর পেলে সেই পুকুরে যান।
৯। পুকুর থেকে রোগাক্রান্ত মাছ তোলার ব্যবস্থা করুন এবং লক্ষণগুলো দেখুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–১১.১ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন–১১.২ : ১। গ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন–১১.৩ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন–১১.৪ : ১। ঘ ২।খ